সংবাদ

29 OCT 2013

জনে জনে জনতা
ডিজিটাল স্কুল গড়ে তুলুন

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের ২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে যখন পুরোই অনিশ্চিত অবস্থা তখনও প্রায় সব দলেই নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। পরস্পরবিরোধী অবস্থানে থাকার পরও বড় দলগুলো মনে করছে নির্বাচন হবে। কেউ কেউ মনে করেন, নির্বাচনের আগেই একটি সমঝোতা হবে। কেউ কেউ এতটা আশাবাদী নন। তারা মনে করেন, মীমাংসাটা রাস্তায় এবং নির্বাচনে হবে, সম্ভবত টেবিলে হবে না। সেই পরিস্থিতিতেও নির্বাচনের কাজ চলছে। ২৮ অক্টোবরে প্রাপ্ত খবর অনুসারে আওয়ামী লীগ ১৫০ প্রার্থী নিশ্চিত করে ফেলেছে। নির্বাচনী ইশতেহারও তৈরি হচ্ছে। আওয়ামী লীগ যেহেতু গত নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছে সেহেতু আওয়ামী লীগের কাছে সামনের নির্বাচনের ইশতেহারেও যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি থাকে সেই প্রত্যাশা দেশবাসীর রয়েছে। আমি সেজন্য একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেছি। দিনে দিনে তাতে ঘষামাজা করা হচ্ছে। সময়মতো সেটি প্রকাশ করা যাবে। শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর বিষয়ে আমার প্রস্তাবনাটি পেশ করছি। প্রস্তাবনাটি এরকম–

কৌশল ১ : ডিজিটাল রূপান্তর ও মানবসম্পদ : বাংলাদেশের মতো একটি অতি জনবহুল দেশের জন্য ডিজিটাল রূপান্তর ও জ্ঞানভিত্তিক রূপান্তরের প্রধানতম কৌশল হতে হবে এর মানবসম্পদকে সবার আগে রূপান্তর করা। এদেশের মানবসম্পদের চরিত্র হচ্ছে যে, জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই তিরিশের নিচের বয়সী। এই জনসংখ্যারও বিরাট অংশ এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জনে নিয়োজিত। অন্যরা প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে সক্ষম। এদের দক্ষ জ্ঞানকর্মী বানাতে হলে প্রথমে প্রচলিত শিক্ষার ধারাকে বদলাতে হবে। এজন্য আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষি শ্রমিক বা শিল্প শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যটিতে জ্ঞানকর্মী তৈরি করার লক্ষ্যে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের নিজের দেশে বা বাইরের দুনিয়াতে কায়িক শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও শিল্প শ্রমিক হিসেবে যাদের কাজে লাগানো যাবে তার বাইরের পুরো জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম জ্ঞানকর্মীতে রূপান্তর করতে হবে। বস্তুত প্রচলিত ধারার শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বাড়তি কোন প্রয়োজনীয়তা হয় তো আমাদের থাকবে না। কারণ যে তিরিশোর্ধ জনগোষ্ঠী রয়েছে, বা যারা ইতোমধ্যেই প্রচলিত ধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছে তাদের প্রচলিত কাজ করার দক্ষতা রয়েছে এবং তারাই এই খাতের চাহিদা মিটিয়ে ফেলতে পারবে। ফলে নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়তায় জ্ঞানকর্মী বানানোর কাজটাই আমাদের করতে হবে। এর হিসেবটি একেবারেই সহজ। বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবিলম্বে জ্ঞানকর্মী সৃষ্টির কারখানা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এটি বস্তুত একটি রূপান্তর। প্রচলিত দালানকোঠা, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ বহাল রেখে এর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করতে হবে।

এই কৌশলটিকে অবলম্বন করার জন্য আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলানো। বিরাজমান শিক্ষাকে একটি ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর করার মধ্য দিয়েই কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। পাঠক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন সব কিছুকে ডিজিটাল করেই এই লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এজন্য জাতিগতভাবে কাজ আমরা শুরু করেছি। একটি বড় উদ্যোগ হলো বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি শিক্ষা। আমাদের স্কুলের ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়টি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হয়েছে। সামনের ১৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীতেও এটি বাধ্যতামূলক হচ্ছে। পরিকল্পনা আছে একে প্রাথমিক স্তরেও বাধ্যতামূলক করার। আমরা এরই মাঝে সরকারিভাবে ২৩ হাজার ৫০০ ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করেছি। ১০ হাজারের বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমরা শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। স্থাপন করছি ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। তৈরি করা শুরু করেছি ডিজিটাল কনটেন্টস। আমার নিজের হাতেই রয়েছে নার্সারি, কেজি ও প্রথম শ্রেণীর ডিজিটাল শিক্ষার জন্য সফটওয়্যার। দেশজুড়ে গড়ে তোলা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া ও ডিজিটাল স্কুলে সেসব সফটওয়্যার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এসব কাজ প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। তবে শুরুটা যেমনতরোই হোক, আমাদের সামনের কাজগুলো আরও স্পষ্ট করতে হবে। আমি পাঁচটি ধারায় এই রূপান্তরে মোদ্দাকথাটা বলতে চাই।

ক. প্রথমত তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়টি শিশুশ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ৫০ নম্বর হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টির মান হতে হবে ১০০। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, ইংরেজি-বাংলা-আরবি নির্বিশেষে সবার জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য হবে।

খ. দ্বিতীয়ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি করে কম্পিউটার হিসেবে কম্পিউটার ল্যাব গড়ে তুলতে হবে। এই কম্পিউটারগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার করতে শেখাবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে নিজেরা এমন যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হতে পারে রাষ্ট্রকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষায় ইন্টারনেট ব্যবহারকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তের মাঝে আনতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিতে হবে।

গ. তৃতীয়ত প্রতিটি ক্লাসরুমকে ডিজিটাল ক্লাসরুম বানাতে হবে। প্রচলিত চক, ডাস্টার, খাতা কলম বইকে কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, স্মার্ট ফোন, বড় পর্দার মনিটর-টিভি বা প্রজেক্টর দিয়ে স্থলাভিষিক্ত করতে হবে।

ঘ. চতুর্থত সব পাঠ্য বিষয়কে ডিজিটাল যুগের জ্ঞানকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও বিষয় নির্ধারণ করে সেসব কনটেন্টসকে ডিজিটাল কনটেন্টে পরিণত করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়নকেও ডিজিটাল করতে হবে। অবশ্যই বিদ্যমান পাঠক্রম হুবহু অনুসরণ করা যাবে না এবং ডিজিটাল ক্লাসরুমে কাগজের বই দিয়ে শিক্ষা দান করা যাবে না। কনটেন্ট যদি ডিজিটাল না হয় তবে ডিজিটাল ক্লাসরুম অচল হয়ে যাবে। এইসব কনটেন্টকে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারঅ্যাকটিভ হতে হবে।

ঙ. পঞ্চমত : সব শিক্ষককে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সব আয়োজন বিফলে যাবে যদি শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল ক্লাসরুম ব্যবহার করতে না পারেন বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করতে না জানেন। তারা নিজেরা যাতে কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন তারও প্রশিক্ষণ তাদের দিতে হবে।

এই পাঁচটি ধারার বিস্তারিত কাজগুলোতে আরও এমন কিছু থাকবে যা আমরা এখানে উল্লেখই করিনি। সেইসব কাজসহ ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার সকল কাজগুলো ২০১৪-১৮ সময়কালে সম্পন্ন করতে হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবনাটি সম্পর্কে আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা শুধু সরকারের কাজ নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বহুলাংশ বেসরকারি খাত দিয়ে পরিচালিত। আমরা এটি প্রত্যাশা করতে পারি না যে, সরকার সব স্কুল ডিজিটাল করবে বা সরকারের কাছ থেকে কম্পিউটার পাওয়ার পর কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি হবে। বরং আমি মনে করি, আমাদের সবারই দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে যুক্ত হওয়া। নিজেদের অবদান যদি নিজেরা না রাখি তবে নিজের বিবেকের কাছে কি আমরা স্পষ্ট থাকতে পারব?

এটি সুখের বিষয় যে, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর বা প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়ে আমাদের সচেতনতা অনেক বেড়েছে। এরই মাঝে দেশজুড়ে অনেক ডিজিটাল স্কুল হয়েছে। ডিজিটাল স্কুল নিয়ে আলোচনাও জোরদার হয়েছে।

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৩ রাতের ইংরেজি খবরের পর প্রচারিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজিটাল বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কথা বলেছি। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল কথা বলেছেন। তার সঙ্গে কথা বলেছেন শিক্ষার ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বিজয় ডিজিটালের প্রধান নির্বাহী জেসমিন জুঁই। ড. জাফর ইকবাল শিক্ষাবিদ হিসেবে আমাদের দেশে কিংবদন্তির মতো গণ্য হয়ে থাকেন। অন্যদিকে জেসমিন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটাল করার জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির একমাত্র পথিকৃৎ। এরই মাঝে তিনি নার্সারি, কেজি ও প্রথম শ্রেণীর জন্য শিক্ষামূলক সফটওয়্যার তৈরি করেছেন। কাগজের বইকে তিনি বাইনারি ডিজিটের প্রকাশনায় রূপান্তর করছেন। ড. জাফর ইকবাল ও জেসমিন দুজনেই একমত হয়েছেন যে, শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার ছাড়া বিকল্প কিছুই নেই। আমরা তাদের দুজনের মতামতকেই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমি নিজে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার জন্য অনেক আগে থেকেই কাজ করছি। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আমি ঢাকার গাজীপুরে প্রথম আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল চালু করি। ২০০০ সাল থেকে সেই স্কুলটি চালু হয়। ২০০৩ সালে গাজীপুরে নতুন স্কুল চালু হয়। কিন্তু স্কুলের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট না পাওয়ায় স্কুলগুলো পুরোপুরি ডিজিটাল হতে পারেনি। এবার যেহেতু ডিজিটাল কনটেন্ট হাতের কাছেই রয়েছে সেহেতু আমি আহ্বান জানাই আসুন আমরা দেশজুড়ে ডিজিটাল স্কুল গড়ে তুলি। ডিজিটাল স্কুল গড়ে তোলার জন্য এখনই আমরা যা করতে পারি তার ছোট একটি রূপ এখানে তুলে ধরলাম। যারা আরও বিস্তারিত জানতে চান তারা আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা যারা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির বাইরেও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চাই তারা সম্ভবত এমন একটি কর্মসূচি নিয়ে সামনে যেতে পারি। সম্ভব হলে ডিজিটাল স্কুল আর তাও যদি না হয় তবে অন্তত একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তুলে আমরা আমাদের সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরে সহায়তা করতে পারি।

কেমন করে ডিজিটাল স্কুল করবেন : ডিজিটাল বা মাল্টিমিডিয়া স্কুল সাধারণ স্কুলই হবে। স্কুল গড়ে তোলার সব অবকাঠামো নিজেকেই করতে হবে। এতে বিনিয়োগ হবে উদ্যোক্তার। সঙ্গত কারণেই এর স্বত্বও থাকবে উদ্যোক্তার। উদ্যোক্তা নিজেই এটি পরিচালনা করবেন, লাভ-লোকসান বা আয়-ব্যয় সবই উদ্যোক্তার। শুধু বিজয় ডিজিটাল স্কুল বা আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল নামে স্কুল করতে হলে ফ্র্যাঞ্চাইজি চুক্তি করতে হবে। কারণ এই নামটি ট্রেডমার্ক নিবন্ধিত। প্রচলিত স্কুলের মতো করেই স্কুল গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। অন্যদিকে বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি স্কুলকেও ডিজিটাল স্কুল বা মাল্টিমিডিয়া স্কুলে রূপান্তর করা যাবে।

সব ক্ষেত্রেই দুটি নতুন বিষয় মনে রাখতে হবে।

ক. শিশুশ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। খ. ক্লাসরুমগুলো পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল ক্লাসরুমে রূপান্তরিত করতে হবে।

উদ্যোক্তা ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে স্কুল শুরু করতে পারেন। এখনও সময় আছে এখনই উদ্যোগ নিয়ে স্কুল তৈরি করে ফেলা যায়। জায়গা, অবকাঠামোর সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। বিদ্যমান স্কুলকে রূপান্তর করা তো আরও সহজ। শুধু ডিজিটাল রূপান্তরটাই সেখানে জরুরি।

নার্সারি- কেজি ও প্রথম শ্রেণীর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি আছে বলে এই ৩টি ক্লাস দিয়ে শুরু করা যায়। প্রচলিত স্কুলের পাঠক্রমে শিশুশ্রেণী থেকে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাজারে বই রয়েছে। এর সঙ্গে ডিজিটাল ক্লাসরুম গড়ে তুলতে হবে। একটি কম্পিউটার ও একটি ২১ ইঞ্চি পর্দার মনিটরকে সঙ্গে স্পিকার যোগ করলেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান শুরু করা সম্ভব। যেসব সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে সেগুলো চালানোর দক্ষতা অর্জন করাও সহজ। যে কোন কম্পিউটার জানা মানুষ ২-৩ ঘণ্টায় পুরো সফটওয়্যারটি চালাতে পারবে। শিশুশ্রেণীর সফটওয়্যারের সঙ্গে বই পাওয়া যায় আর প্রথম শ্রেণীর সফটওয়্যারের সঙ্গে বোর্ডের বই পাঠ করা যেতে পারে। কারণ প্রথম শ্রেণীর সফটওয়্যারটি বোর্ডের বইকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

এর সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে ইন্টারনেট। যেখানে থ্রিজি রয়েছে সেখানে থ্রিজি এবং যেখানে তা নেই সেখানে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করতে হবে। ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় থেকে ওপরের শ্রেণীগুলোর ক্লাসরুমও ডিজিটাল করা যায়। ইন্টারনেটে বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল কনটেন্ট রয়েছে। সেসব ক্লাসে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কামনা করব আমরা শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরে অবদান রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সৈনিক হবো।

[লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস এর চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, বিজয় কিবোর্ড ও সফটওয়্যারের জনক
mustafajabbar@gmail.com]